হিপ্‌নোজেন

৭ই মে

আমার এই ছেষট্টি বছরের জীবনে পৃথিবীর অনেক জায়গা থেকে অনেকবার অনেক রকম নেমন্তন্ন পেয়েছি ; কিন্তু এবারেরটা একেবারে অভিনব। নরওয়ের এক নাম-না-জানা গণ্ডগ্রাম থেকে এক এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম ; টেলিগ্রাম মানে চিঠির বাড়া ; গুনে দেখেছি একশো তেত্রিশটা শব্দ। যিনি করেছেন তাঁর নাম আগে শুনিনি। নতুন কোনও চরিতাভিধানে তাঁর নাম খুঁজে পাইনি। এনসাইক্লোপিডিয়াতেও নেই। পঁচিশ বছরের পুরনো এক জার্মান 'হুজ হু'-তে বলছে—আলেকজান্ডার ক্রাগ নামে এক ভদ্রলোক ব্রেজিলের এক হিরের খনির মালিক ছিলেন ; তিনি নাকি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। সুতরাং এই আলেকজান্ডার ক্রাগ নিশ্চয়ই অন্য ব্যক্তি। কিন্তু ইনি যে-ই হন না কেন, আমাকে এঁর এত জরুরি প্রয়োজন কেন সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। টেলিগ্রাম বলছে প্লেনের টিকিট চলে আসছে আমার নামে—প্রথম শ্রেণীর টিকিট—আমি যেন সেটা পাওয়ামাত্র নরওয়ে রওনা দিই। অস্‌লোর বিমানঘাঁটিতে গাড়ি অপেক্ষা করবে, সে গাড়ির নম্বর ও ড্রাইভারের নাম দেওয়া আছে টেলিগ্রামে। সেই গাড়িই আমাকে নিয়ে যাবে এই রহস্যময় মিঃ ক্রাগের বাসস্থানে। সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগবে পৌঁছাতে সে কথাও বলা আছে, এবং আরও বলা আছে যে যাওয়াটা আমার পক্ষে লাভজনক হবে, কারণ সেখানে নাকি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ—অন্যতম শ্রেষ্ঠ নয়, একেবারে শ্রেষ্ঠ—বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন মিস্টার ক্রাগ। কে এই অত্যাশ্চর্য খামখেয়ালি ভদ্রলোক ? আমার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছেটা তেমন প্রবল না হলে সে অত খরচ করে তার করবে কেন ?

যাই হোক—নরওয়েতে এখন মধ্যরাত্রের সূর্যের পর্ব চলেছে। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে এ সময়টা—অর্থাৎ মে মাসে—রাতের অন্ধকার বলে কিছু নেই। এ জিনিসটা আমার দেখা হয়নি এখনও। তাই ভাবছি ভদ্রলোককে সম্মতি জানিয়ে টেলিগ্রাম করে দেব। আমার তাতে কোনও খরচ নেই, কারণ ভদ্রলোক একশো টাকার প্রিপেড টেলিগ্রাম করেছেন, যদিও আমি চেষ্টা করেও ডজনখানেকের বেশি শব্দ ব্যবহার করতে পারব না।

৯ই মে

আজ একটা আর্টের বইয়ের পাতা উলটোতে উলটোতে হঠাৎ দেখলাম ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত ইটালিয়ান শিল্পী তিনতোরেত্তোর একটা ছবির তলায় খুদে খুদে অক্ষরে লেখা রয়েছে 'আলেকজান্ডার ক্রাগের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে'। যে লোক তিনতোরেত্তোর মতো শিল্পীর ছবি নিজের বাড়িতে রাখার ক্ষমতা রাখে সে যে ডাকসাইটে ধনী তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আমি পরশু রওনা হচ্ছি। ক্রাগকে জানিয়ে দিয়েছি। বেশ একটা চনমনে উৎসাহ

অনুভব করছি। মন বলছে আমার নরওয়ে সফর মাঠে মারা যাবে না।

১২ই মে

অস্‌লো এয়ারপোর্ট থেকে উর্দিপরা ড্রাইভার-চালিত ডেমলার গাড়িতে করে আমরা আধ ঘণ্টা হল রওনা দিয়েছি আলেকজান্ডার ক্রাগের বাসস্থানের উদ্দেশে। আমরা অর্থাৎ আমি ছাড়া আরও দুজন। এর মধ্যে একজন—ইংলন্ডের পদার্থবিজ্ঞানী জন সামারভিল—আমার পুরনো বন্ধু। অন্যজনের সঙ্গে এই প্রথম আলাপ ; ইনি হলেন গ্রিসের বায়োকেমিস্ট হেক্টর পাপাডোপুলস। তিনজনের মধ্যে এনারই বয়স সবচেয়ে কম ; দেখে মনে হয় চল্লিশের বেশি না। মাথাভরা কোঁকড়া ঘন কালো চুল, এবং তার সঙ্গে মানানসই ঘন ভুরু ও ঘন গোঁফ। আমরা তিনজন ঠিক একইভাবে আমন্ত্রিত হয়েছি ; একই টেলিগ্রাম, একই ব্যবস্থা। এটা অবিশ্যি অস্‌লোতে আসার পরে জানলাম। আমি যেই তিমিরে, এরাও সেই তিমিরে। সামারভিলও ক্রাগের নাম শোনেনি। পাপাডোপুলস বলল শুনে থাকতে পারে, খেয়াল নেই। তবে টেলিগ্রামের দৈর্ঘ্য, প্রথম শ্রেণীর টিকিট, আর এখন এই ডেমলার গাড়ি আর ড্রাইভারের পোশাকের বাহার দেখে এটা তিনজনেই বুঝেছি যে, আলেকজান্ডার ক্রাগের পয়সার অভাব নেই।

আপাতত আমরা মাঝপথে থেমেছি কফি খেতে। এখন বিকেল সাড়ে তিনটে। ঠাণ্ডা যতটা হবে আশা করেছিলাম ততটা নয়। অবিশ্যি নরওয়েতে তাপমাত্রার খামখেয়ালিপনার কথা যে কোনও ভূগোলের ছাত্রই জানে। এ দেশে উত্তরপ্রান্তে শীতের মাত্রা দক্ষিণের চেয়ে কম, কারণ আটলান্টিক থেকে এক ধরনের গরম হাওয়া নরওয়ের উত্তরাংশের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে বয়, ফলে উচ্চতা এবং উত্তর মেরুর সান্নিধ্য সত্ত্বেও তাপমাত্রা দক্ষিণের চেয়ে বেশি বেড়ে যায়।

আমরা যেখানে বসে কফি খাচ্ছি সেটা রাস্তার ধারে একটা রেস্টোর‍্যান্ট। ভারী নির্জন, সুরম্য পরিবেশ। নরওয়েতে সমতলভূমি বলে প্রায় কিছুই নেই, সারা দেশটাকেই উপত্যকা বলা চলে, তারই মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে আছে বরফে ঢাকা পাহাড়। ড্রাইভার পিয়েট নোরভালের কাছে জানলাম ক্রাগের বাসস্থান অস্‌লো থেকে তিনশো ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। আমাদের পৌঁছোতে লাগবে আরও ঘন্টা আড়াই।

১২ই মে, রাত সাড়ে ন'টা

রাত বলছি ঘড়ি দেখে, যদিও জানি, আকাশের দিকে চাইলে আর ও শব্দটা ব্যবহার করতে মন চাইবে না।

কী আশ্চর্য এক জায়গায় এসে হাজির হয়েছি সেটা বলা দরকার। জায়গার আগে অবিশ্যি মানুষটার কথা বলতে হয়। কারণ এই বাসস্থান—রাজপুরীও বলা চলে—এই মানুষের একার তৈরি। মধ্যযুগীয় কেল্লার ঢং-এর বাড়ি দেখে মনে হবে বয়স সাত-আটশো বছরের কাছাকাছি, কিন্তু আসলে তৈরি এই বিংশ শতাব্দীতেই। কত খরচ লেগেছিল জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ভদ্রলোককে যে অবস্থায় দেখলাম, তাতে আর এ সব অবান্তর প্রশ্ন করা চলে না। আলেকজান্ডার অ্যালয়সিয়াস ক্রাগ এখন মৃত্যুশয্যায়। তাঁর শেষ অবস্থা অনুমান করেই তিনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। কেন ডেকেছেন তার তাজ্জব কারণটা এখন বলি।

ঠিক ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিটে ক্রাগ-কেল্লার প্রকাণ্ড ফটকের ভিতর দিয়ে গাড়ি ঢুকে আরও

pathagar.blogspot.com

পাঁচ মিনিট পপলার, আসপেন ও ঝাউ গাছের ছায়ায় ঢাকা অতি সুদৃশ্য আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে আমরা কেল্লার সদর দরজার সামনে পৌঁছোলাম। একজন উর্দিপরা মাঝবয়সি লোক আমাদেরই জন্য বোধ হয় অপেক্ষা করছিল ; সে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে কাস্‌লের ভিতর নিয়ে গেল।

যে ঘরটাতে আমরা প্রথম ঢুকলাম সেটাকে ওয়েটিংরুম বলা চলে, কিন্তু তার চোখধাঁধানো বাহার দেখে আমাদের তিনজনেরই কিছুক্ষণের জন্য কথা বন্ধ হয়ে গেল। আসবাবপত্র, মার্বেলের মূর্তি, ঝাড়লণ্ঠন, গিল্ট করা ফ্রেমে বাঁধানো বিশাল অয়েলপেন্টিং, মেঝেতে পারস্যদেশীয় আলিসান গালিচা, দেয়ালের গায়ে ঝোলানো অস্ত্রশস্ত্র, পেডেস্টালে দাঁড় করানো লোহার বর্ম—সব মিলিয়ে আমাদের মনটাকে টেনে নিয়ে গেল সেই ব্যারনদের যুগে যারা ডাকাতি করে কোটি কোটি টাকা করে ফুর্তি করে আমোদ করে জীবন কাটাত। পাপাডোপুলস বিজ্ঞানী হলেও অন্যান্য বিষয়ে দেখলাম অনেক কিছু জানে। চারিদিকে দেখে বলল, এই একটি ঘরে যা পেন্টিং রয়েছে, তারই দাম হবে কয়েক কোটি টাকা। আমি নিজে একখানা রেমব্রান্ট ও একখানা ফ্রাগোনারের ছবি দেখে চিনেছি। সারা দুর্গের ঘরময় আরও কত কী ছড়িয়ে আছে কে জানে।

মিনিটদশেক অপেক্ষা করার পর সে লোকটি ফিরে এসে বলল ক্রাগসাহেব নাকি দর্শন দেবার জন্য প্রস্তুত। আমরা তিনজন তাকে অনুসরণ করে আরও দু' খানা বিশাল ঘর এবং অজস্র মহামূল্য জিনিসপত্র পেরিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট, আবছা অন্ধকার ঘরে গিয়ে পৌঁছোলাম। ঘরের একটি জায়গায় একটিমাত্র ল্যাম্প জ্বলছে, এবং সেই ল্যাম্পের আলো গিয়ে পড়েছে একটা বিচিত্র কারুকার্য করা প্রকাণ্ড পালঙ্কের উপর শোওয়া এক অতি প্রাচীন ভদ্রলোকের উপর। তুলোর বালিশে পিঠ দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় যিনি আমাদের দিকে রোগক্লিষ্ট অথচ আশ্চর্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, তিনিই যে এই কেল্লার অধিপতি শ্রীআলেকজান্ডার ক্রাগ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সাটিনে মোড়া লেপ দিয়ে তাঁর থুতনি অবধি ঢাকা, শীর্ণ হাত দুটো লেপের বাইরে বুকের উপর জড়ো করা। ডান হাতটা এবার বাঁ হাত থেকে আলগা হয়ে শরীর থেকে উঠে আমাদের দিকে প্রসারিত হল। আমরা পর পর তিনজন ক্রাগের সঙ্গে করমর্দন করলাম।

খাটের পাশে তিনটে চামড়ায় মোড়া চেয়ার রাখা ছিল—ক্রাগ ঘাড় নাড়িয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করতে আমরা তিনজন গিয়ে বসলাম। এবারে ক্রাগের ডান হাত তার পাশে ঝুলন্ত একটা রেশমের দড়িতে মৃদু টান দিতে একটা ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল, আর তারপরেই প্রায় নিঃশব্দে একটি প্রাণী ঘরের পিছন দিকের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ক্রাগের ঠিক পাশে এসে দাঁড়াল। প্রাণী বলছি এই কারণে যে মানুষ বললে বর্ণনা ঠিক হবে না। এরকম মানুষ আমি এর আগে কখনও দেখিনি। প্রায় সাত ফুট লম্বা দেহ, গায়ের রং কালচে নীল, চামড়া প্রায় পালিশ করা ইস্পাতের মতো মসৃণ। পোশাক হল হাঁটু অবধি গাঢ় লাল মখমলের আলখাল্লা, আর কোমরে একটা রুপালি বেল্ট বা কোমরবন্ধ। মুখের ধাঁচ এবং কেশবিহীন মস্তকের নিটোল গড়ন দেখলে মনে হবে যেন পুরাণের কোনও দেবতা মানুষের আকারে এসে হাজির হয়েছে।

আগন্তুক অবশ্যই ভৃত্যস্থানীয়। সে এসে ক্রাগের উপর ঝুঁকে পড়ে তার ডান হাত দিয়ে তার মনিবের কপালের দুই প্রান্ত টিপে ধরল। প্রায় দশ সেকেন্ড এইভাবে থাকার পর হাত সরিয়ে নিতেই ক্রাগের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ করলাম ; তিনি যেন দেহে নতুন বল পেয়েছেন। দু' হাতে বিছানার উপর ভর করে বেশ অনেকটা উঠে বসে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে তিনি পরিষ্কার ইংরাজিতে বললেন, 'ওডিন আমার নিজের হাতে মানুষ করা বিশ্বস্ত

পরিচারক। তার অনেক গুণের মধ্যে একটা হল মুমূর্ষু মানুষকেও সে কিছুক্ষণের জন্য চাঙ্গা করে দিতে পারে, যাতে সে মানুষ তার অতিথিদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে।'

মিস্টার ক্রাগ চুপ করলেন। চাকরের নামটা শুনে বুঝলাম আমার অনুমান মিথ্যা নয়। ক্রাগ নিজেও তাঁর পরিচারককে দেবতা হিসেবেই কল্পনা করেন। নরওয়ের পুরাণে ওডিন হল দেবতাদের শীর্ষস্থানীয়। সেই ওডিন এখন ধীরে ধীরে পিছু হেঁটে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমি ও সামারভিল দুজনেই নির্বাক, তটস্থ। পাপাডোপুলসের বয়সটা কম বলেই বোধ হয় সে কিছুটা ছটফটে। সে ইতিমধ্যে দুবার গলা খাকরানি দিয়েছে, এবং অনবরত হাত কচলাচ্ছে।

'ওডিন ও থর,' বললেন মিস্টার ক্রাগ, 'এই দুজনেই আমার অধিকাংশ কাজ করে। থরের সঙ্গে তোমাদের যথাসময়ে পরিচয় হবে।'

থর হল নরওয়ের আরেকজন শক্তিশালী দেবতার নাম।

পাপাডোপুলস আর ধৈর্য রাখতে পারল না।

'আপনি একজন বৈজ্ঞানিকের কথা লিখেছিলেন...'

ক্রাগের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। সেইসঙ্গে তাঁর চোখদুটো আবার জ্বলজ্বল করে উঠল।

'সেই বিজ্ঞানী এখন মৃত্যুশয্যায়,' বললেন ক্রাগ। 'তিনিই তোমাদের আসতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরই নাম আলেকজান্ডার অ্যালয়সিয়াস ক্রাগ।'

পাপাডোপুলস কেমন হতাশ হল বলে মনে হল। আমিও ঠিক এই উত্তর আশা করিনি। আমরা তিনজনেই একবার পরস্পরের দিকে চেয়ে নিলাম। ক্রাগ আবার কথা শুরু করলেন।

'কথাটা বিশ্বাস করা হয়তো তোমাদের পক্ষে সহজ হবে না, যদিও এর প্রমাণ তোমরা পাবে। আমার এই দুর্গের চল্লিশটা ঘরের মধ্যে একটা হল ল্যাবরেটরি। আমি আজ বিরানব্বুই বছর ধরে সেখানে নানারকম গবেষণা করেছি।'

এইটুকু বলে ক্রাগ থামলেন। কারণটা স্পষ্ট ; বিরানব্বুই বছর শুনে আমাদের মনে স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন জাগবে সেটা উনি আন্দাজ করেছিলেন। সে প্রশ্ন করার আগে ক্রাগ নিজেই তার উত্তর দিলেন।

'আমার বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার জোরেই আমি তিন তিনবার অবধারিত মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রেখে আমার আয়ু বাড়িয়ে নিতে পেরেছি। কিন্তু এবার আর সেটা সম্ভব হচ্ছে না।'

যখনই ভদ্রলোকের কথা থামছে তখনই আমাদের পরিবেশের আশ্চর্য নিস্তব্ধতা অনুভব করছি। এত বড় দুর্গের মধ্যে একটি শব্দও আসছে না কোথাও থেকে।

'নেপোলিয়নের মৃত্যু ও আমার জন্ম একই দিনে। ৫ই মে, ১৮২১।'

'দেড়শো বছর বয়স আপনার ?'

পাপাডোপুলস মাত্রা ছাড়িয়ে একটু অস্বাভাবিক রকম জোরেই প্রশ্নটা করে ফেলেছিল। ক্রাগ মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি এতেই আশ্চর্য হচ্ছ, তা হলে এরপরে যা ঘটতে চলেছে, তাতে তোমার প্রতিক্রিয়া কী হবে ?'

পাপাডোপুলস চুপ করে গেল। ক্রাগ বলে চললেন—

'বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। প্রোফেসর রাসমুসেনের প্রিয় ছাত্র। বলতেন—তুমি অধ্যাপনা করবে, গবেষণা করবে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমার।—কিন্তু আমার চরিত্রের আরেকটা দিক ছিল। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। সাতাশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাই। ইউরোপ ছেড়ে দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে হাজির হই। মন চলে যায় জুয়ার দিকে। কপালও ছিল অবিশ্বাস্য রকম ভাল। রিও ডি জ্যানিরোতে রুলেট খেলে এক রাতে লাখ টাকার উপর হাতে আসে। সেই টাকা লাগাই হিরে প্রস্‌পেকটিং-এর কাজে। আফ্রিকায় তখনও হিরে আবিষ্কার হয়নি, কাজেই ব্রেজিলেই থেকে যাই। আমার এই যে এত সম্পত্তি দেখছ—চারিদিকে এত মহামূল্য জিনিসের সমারোহ—এর পিছনে রয়েছে হিরে। এই একটি হিরের দাম কত জান ?'

প্রশ্নটা করে ক্রাগ তাঁর ডান হাতটা আমাদের দিকে তুলে ধরলেন। দেখলাম অনামিকায় একটি বিশাল হিরেবসানো আংটি জ্বলজ্বল করছে।

'বিশ বছর ব্রেজিলে থেকে তারপর ফিরে আসি আমার দেশে। আমি তখন ক্রোড়পতি।

তখনই মাথায় আসে একটা কাস্‌ল বানাব। আমার দামি জিনিসের নেশা চেপেছে তখন। তার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান চাই। কাস্‌ল তৈরি হল। আমার সব কিছু নিয়ে তারমধ্যে বাস করতে শুরু করলাম। অনেকে একা থাকতে পছন্দ করে না ; আমার কিন্তু দিব্যি লাগত। কেবল আমি আর আমার বহুমূল্য সব সাধের সামগ্রী। বাড়ি থেকে আর বেরোইনি তারপর থেকে। জিনিসপত্র যা কিনেছি সবই চিঠি লিখে। পোস্টআপিসের লোক এসে সব কিছু আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে। এক সময়—তখন আমার বয়স ষাট পেরিয়েছে—হঠাৎ একদিন আমার একমাত্র সঙ্গী আমার পোষা কুকুরটা মারা গেল। সেই থেকে মনে হল—আমারও তো একদিন মরতে হবে—এত সাধের জিনিস, সব ফেলে রেখে চলে যেতে হবে। কৃত্রিম উপায়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে আয়ু বাড়ানো যায় না ?...ল্যাবরেটরি হল। অধ্যাপক রাসমুসেনের কথা ফলল পঁয়তাল্লিশ বছর পরে। কাজের ক্ষমতা ছিল তখনও। গবেষণা শুরু করলাম। তার যে কী ফল হয়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু...'

ক্রাগ দম নেবার জন্য থামলেন। আমরা তিনজনেই গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কথা শুনছিলাম। পাপাডোপুলসের হাত কচলানো থেমে গেছে। ক্রাগের নিশ্বাস আবার দ্রুত পড়তে শুরু করেছে। আবার তাঁর মধ্যে অবসন্নতার ভাব লক্ষ করছি।

'কিন্তু...আমার ওষুধ অনির্দিষ্ট কালের জন্য মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। সেটা আমি জানতাম, তাই আমাকে আবার আরেকটা গবেষণায় অনেকটা সময় ও অনেকটা অর্থ ব্যয় করতে হয়।'

'মিস্টার ক্রাগ'—এবার সামারভিল মুখ খুলেছে—'আপনি কি বলতে চান দেড়শো বছর বেঁচেও আপনার বাঁচার সাধ মেটেনি ? বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে তো ক্রমে মানুষের জীবনের মোহ কেটে যায়—তাই নয় কি ?'

'আমার সে মোহ কাটেনি, জন সামারভিল !'

ক্রাগের দৃষ্টি বিস্ফারিত। তিনি সটান চেয়ে আছেন সামারভিলের দিকে। নিজের অবস্থার কথা অগ্রাহ্য করে তিনি আবার উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন—'

'আমার আসল কাজই এখনও বাকি।...আমার অন্তিম অ্যাডভেঞ্চার !'

কথাটা বলার সময় ক্রাগের মাথাটা বালিশ থেকে খানিকটা উঠে এসেছিল ; কথা শেষ হওয়ামাত্র মাথা বালিশে এলিয়ে পড়ল। পিছন থেকে দেখি প্রভুভক্ত ওডিন এগিয়ে এসে আবার খাটের পাশে দাঁড়িয়েছে—বোধ হয় আদেশের অপেক্ষায়।

ক্রাগ বেশ খানিকটা শক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে সামলে নিয়ে এবার অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে বললেন, 'মানুষকে অনির্দিষ্ট কাল বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু—' ক্রাগ কেন জানি আমারই দিকে সটান দৃষ্টি দিয়ে বাকি কথাটা বললেন—'কিন্তু মরা মানুষকে অন্তত একবারের মতো বাঁচিয়ে তোলা যায়।'

ঘরে আবার সেই অমোঘ নিস্তব্ধতা। তারই মধ্যে অন্য কোনও ঘর থেকে তিনটে ঘড়িতে তিন রকম আশ্চর্য সুন্দর সুরে সাতটা বাজার শব্দ পেলাম। এবারে ক্রাগের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। বুঝলাম তাঁর শক্তি ক্রমশ কমে আসছে।

'আমি পরীক্ষা না করে বলছি না কথাটা। এ বাড়িতে এমন লোক আছে যে মৃত্যুর পরে আবার বেঁচে উঠে আমার কাজ করছে। আজ রাতটা আমার কাটবে না। ওডিনও এ অবস্থায় আর আমাকে নতুন শক্তি দিতে পারবে না। কাল সকালে ওডিন তোমাদের সাহায্য করবে। সে আমার মৃতদেহ নিয়ে যাবে একটি বিশেষ ঘরে। তোমরাও যাবে তার সঙ্গে। সেখানে সব তৈরি। সমস্ত নির্দেশ দেওয়া আছে চার্টে। বৈজ্ঞানিক ছাড়া সে চার্টের মানে বুঝবে না। তোমরা পারবে। ওডিন আমাকে একটি বিশেষ জায়গায় শুইয়ে দেবে।

তারপর বাকি কাজটা তোমাদের। মৃত্যুর বারো ঘন্টা পর তোমাদের কাজ শুরু হবে। তার তিন ঘন্টা পরে আমার দেহে নতুন প্রাণের লক্ষণ দেখতে পাবে। তারপর তোমাদের কাজ শেষ। একজনের উপর নির্ভর করা যায় না, তাই তোমাদের তিনজনকে একসঙ্গে ডেকেছি। আমি জানি তোমরা আমাকে হতাশ করবে না, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।'

ক্রাগ চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর শেষ কথাগুলো বুঝতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। এই নিস্তব্ধতার সুযোগে পাপাডোপুলস হঠাৎ আরেকটা প্রশ্ন করে বসল।

'কাজটা হয়ে গেলেই আমাদের ছুটি তো ?'

ক্রাগের চোখের পাতা দুটো অল্প ফাঁক হল। তাঁর ঠোঁটের কোণ দুটো যেন ঈষৎ হাসির ভঙ্গিতে উপর দিকে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সেই বেহুঁশ অবসন্ন ভাব।

এবার ওডিনের দেহ নড়ে উঠল। তার ডান হাতটা খাটের পাশের টেবিলের উপর রাখা একটা ছোট্ট কালো বাক্সের একটা বিশেষ অংশের উপর মৃদু চাপ দিল। অমনি শোনা গেল ক্রাগের কণ্ঠস্বর—বাক্সের ভিতরে রাখা টেপ থেকে কথা বেরোচ্ছে পরিষ্কার ইংরিজি উচ্চারণে—

'তোমরা আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করায় আমি কৃতজ্ঞ। আমার চাকর নিল্‌স তোমাদের দুর্গ ঘুরিয়ে দেখাবে। কোনও প্রশ্ন থাকলে তাকে বলতে পারো। খাদ্য ও পানীয় যখন যা প্রয়োজন নিল্‌সকে বললে এনে দেবে। এখন বিদায়।'

নিল্‌স নামক চাকরটি ঘরের বাইরেই ছিল, টেপের কথা শেষ হতেই সে এসে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল ক্রাগের কেল্লার অন্য ঘরগুলো দেখাতে।

'তুমি গ্রিক ভাষা জান ?' পাপাডোপুলস নিল্‌সকে প্রশ্ন করল করিডর দিয়ে যেতে যেতে। নিল্‌স মাথা নেড়ে বলল, 'ওনলি ইংলিশ অ্যান্ড নরউইজিয়ান।'

'তোমার বয়স কত হল ?'

আমি জানি পাপাডোপুলস কেন প্রশ্নটা করেছে : নিল্‌সকে দেখে সত্যিই কাজের পক্ষে অত্যন্ত বেশি বুড়ো বলে মনে হয়।

'তিরাশি,' বলল নিল্‌স।

'কদ্দিন কাজ করছ এখানে ?'

'পঞ্চান্ন বছর।' তারপর একটু থেমে বলল, 'গত সাতই ডিসেম্বর হৃদরোগে আমার মৃত্যু হয়। মাই মাস্টার ব্রট মি ব্যাক্ টু লাইফ।'

এখানে কি সবাই ছিটগ্রস্ত, না সবাই মিথ্যে কথা বলছে ? ক্রাগ কি আমরা আসার আগে তার চাকরদের শিখিয়ে রেখেছে কোন প্রশ্নের কী জবাব দিতে হবে ?

'এখন দিব্যি সুস্থ মনে হয় নিজেকে ?'

প্রশ্নটা পাপাডোপুলস যেন খানিকটা ঠাট্টার সুরেই করল, কিন্তু নিল্‌স উত্তরটা দিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে।

'এত সুস্থ বহুকাল বোধ করিনি।'

ঘণ্টাখানেক ধরে কেল্লার সমস্ত ঘর ঘুরে দেখে আমরা যে যার ঘরে ফিরে গেলাম। একটা বিশেষ তালাবন্ধ ঘর ছাড়া আমরা সব ঘরই দেখেছি। প্রত্যেকটা ঘরকেই একটা ছোটখাটো মিউজিয়ম বা আর্ট গ্যালারি বলা চলে। ওই একটি ঘর বন্ধ কেন জিজ্ঞেস করাতে নিল্‌স কোনও উত্তর দিল না। নিঃসন্দেহে ওটাই ক্রাগের ল্যাবরেটরি, কারণ অন্য ঘরগুলোর কোনওটারই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোনও সম্পর্ক নেই।

আমার শোবার ঘরটাকে বলা চলে একেবারে আয়েশের পরাকাষ্ঠা। ঘরের যা আয়তন তাতে আমার পুরো গিরিডির বাড়িটা ঢুকে যায়। সমস্ত দুর্গটাতেই সেন্ট্রাল হিটিং ; ঘরে ঘরে

থারমোমিটার রয়েছে। পঁচাত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইটে এসে পারা দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঘরের এক পাশে একটা মখমলের সোফায় বসে সবে পকেট থেকে ডায়রিটা বার করেছি এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। সামারভিল ও পাপাডোপুলসের প্রবেশ। প্রথমজন যথারীতি শান্ত, ভিতরে উত্তেজনা থাকলেও বোঝার উপায় নেই, কিন্তু গ্রিক ভদ্রলোকটি ঘরে ঢুকেই একটি বাছাই করা জোরালো গ্রিক শব্দে তার মনের ভাব প্রকাশ করলেন, যার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'যত্তো সব— !'

সামারভিল আমার পাশে বসে পড়ে বলল, 'এই তামাশায় অংশগ্রহণ করাটা কি আমাদের মতো লোকের সাজে ? হাজার হোক আমরা তো একেবারে ফ্যালনা নই !—আমাদের একটা প্রতিষ্ঠা আছে, সমাজে বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে একটা সুনাম আছে।'

আমি বললাম, 'দেখো জন, আমরা যখন ক্রাগের পয়সায় এখানে এসেছি, তার আতিথ্য গ্রহণ করেছি, তখন এত সহজে মাথা গরম করলে চলবে না। কাল সকালেই তার তিরোধান হবার কথা। দেখাই যাক না তারপর কী হয়। লোকটা বুজরুক কি না সে তো তখনই বোঝা যাবে। আর সে লোক যদি না-ই মরে তা হলে তো এমনিও কিছু করার নেই। যদ্দিন সে না মরছে তদ্দিন সে নিশ্চয়ই আমাদের ধরে রেখে দেবে না।'

পাপাডোপুলস তার বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুঁষি মেরে বলল, 'বৈজ্ঞানিক দেখাবার লোভ দেখিয়ে আমাদের কী ভাঁওতাই দিল বলো তো। ছি ছি ছি !'

একটা ব্যাপারে আমার মনটা খচ খচ করছিল, সেটা এবার না বলে পারলাম না।

'আমিও তোমাদের সঙ্গে একমত হতাম, কিন্তু একটা কারণে হতে পারছি না।'

'কী কারণ ?' সমস্বরে প্রশ্ন করে উঠলেন দুজনেই।

'ওডিন।'

নামটা উচ্চারণ করতেই পাপাডোপুলস হাঁ হাঁ করে উঠল।

'ওডিন ? একটা জাঁদরেল লোককে মেকআপ করে মাথা মুড়িয়ে নাটুকে পোশাক পরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তাতে খটকার কী আছে ? তুমি কি ভাবছ রগ টিপে শক্তি সঞ্চার করাটা বুজরুকি নয় ? হুঁঃ ! ক্রাগের পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা। বলে দেড়শো বছর বয়স ! ওর সব কথাগুলোর মধ্যে কেবল একটা সত্যি হতে পারে, সেটা হল জুয়ো খেলে পয়সা করার ব্যাপারটা। ও যে সব দামি ছবিটবি দিয়ে ঘর সাজিয়েছে, সে তো আমার মনে হচ্ছে হয় চোরাই মাল, না হয় জাল জিনিস। কোন ডাকাতের পাল্লায় পড়েছি কে জানে !'

আমি এবার আসল কথাটা বললাম।

'ওডিনের চোখে পলক পড়ছিল না।'

সামারভিল ও পাপাডোপুলস দুজনেই অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল। 'তুমি ঠিক দেখেছ ?' প্রশ্ন করল সামারভিল।

'অন্তত পাঁচ মিনিট একটানা চেয়ে ছিলাম তার দিকে। অতক্ষণ ধরে নিষ্পলক দৃষ্টি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ধারণা ওডিন একটি যান্ত্রিক মানুষ। অর্থাৎ রোবট। এ রকম রোবটের অভিজ্ঞতা আমার এর আগেও একবার হয়েছে।'

সামারভিল বলল, 'তা হলেও কি প্রমাণ হয় যে ক্রাগ নিজে বৈজ্ঞানিক, এবং সে নিজেই রোবটটি তৈরি করেছে ?'

'না, তা হয় না। তার নিজের দৌড় বোঝা যাবে যদি তার আবিষ্কৃত উপায়ে মরা মানুষকে আবার—'

আমার কথা আর শেষ হল না ; ঘরের বাতি হঠাৎ ম্লান হয়ে প্রায় নিভে গিয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। জানালার পরদা টানা, তাই ঘরে আলো ঢুকছে না।

priyoboi.blogspot.com

'কী ব্যাপার ?' বলল পাপাডোপুলস। 'হঠাৎ কী করে—'

পাপাডোপুলসের প্রশ্ন ছাপিয়ে একটা গুরুগম্ভীর অশরীরী কণ্ঠস্বর ঘরটাকে কাঁপিয়ে দিল।

'দ্য মাস্টার ইজ ডেড !'

তারপর কয়েক মুহূর্ত নৈঃশব্দ। পাপাডোপুলসের মুখ ফ্যাকাশে। সামারভিল সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। তারপর আবার সেই কণ্ঠস্বর।

'দ্য মাস্টার উইল লিভ এগেন !'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের বাতি আবার আগের অবস্থায় ফিরে এল।

'এই ঘরের মধ্যেই কোথাও একটা স্পিকার লুকোনো রয়েছে,' বলল পাপাডোপুলস।

'সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে,' বলল সামারভিল, 'কিন্তু খবরটা সত্যি কি না এবং ভবিষ্যদ্বাণী ফলবে কি না সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।'

পাপাডোপুলস চেয়ারে বসে ছিল, এবার উঠে পায়চারি করতে করতে বলল, 'ভদ্রলোকের নাটুকেপনা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

কথাটা ভুল বলেনি। আমারও এখানে এসে অবধি সেটা অনেকবার মনে হয়েছে। আজ যখন নিল্‌সের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কাস্‌লের ঘরগুলো দেখছিলাম তখনও এটা মনে হচ্ছিল। বিংশ শতাব্দীতে এ রকম একটা দুর্গের পরিকল্পনাটাই নাটুকে। ওই যে একটা ঘরের দরজায় বিশাল একটা তালা ঝুলিয়ে ঘরটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে, ওটাই বা কি কম নাটুকে ? পাপাডোপুলস বলছিল ঘরে চোরাই মাল রাখা আছে ; কিন্তু আমার সেটা বিশ্বাস হয় না। বিশ্বের কোনও নাম করা মিউজিয়ম থেকে ক্রাগ যদি কিছু চুরি করে থাকে, তা হলে সে খবর কাগজে বেরোত, এবং সেটা আমরা জানতাম। হয় ক্রাগ অকারণে রহস্য করছে, না হয় সত্যিই গোপনীয় কিছু রাখা আছে ওই ঘরে।

ঘড়ি ধরে রাত আটটায় নিল্‌স এসে খবর দিল ডিনার রেডি। রাজভোগ্য আহার। যে লোকটা পরিবেশন করছিল তাকেও দেখে অত্যন্ত প্রাচীন বলে মনে হচ্ছিল ; কিন্তু সে কত দিন হল ক্রাগের কাজ করছে সে কথা জিজ্ঞেস করার ভরসা পেলাম না তিনজনের একজনও। মরে গিয়ে বেঁচে ওঠা লোকের হাতে পরিবেশন করা খাবার খাচ্ছি জানলে সে খাবার যতই সুস্বাদু হোক, পেটে গিয়ে হজম হত না।

সাড়ে আটটা নাগাত পরস্পরকে গুড নাইট জানিয়ে আমরা যে যার ঘরে চলে গেলাম। ঘরে এসে পরদা সরিয়ে বাইরে সূর্যের আলো আছে কি না দেখতে গিয়ে দেখি ঘরটা আসলে কেল্লার ভিতর দিকে। বাইরেটায় আকাশের পরিবর্তে রয়েছে একটা অন্ধকার করিডর। একটা দেওয়াল দেখতে পাচ্ছি ; মনে হয়, সেটা হাত দশেকের মধ্যে। দেওয়ালের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা বর্ম-আঁটা যোদ্ধার মূর্তি।

আমি খাটে এসে বসলাম। কাল কপালে কী আছে কে জানে। একটা কথা বার বারই মনে হচ্ছে ; ক্রাগের একটা উক্তি—

'আমার আসল কাজই এখনও বাকি। আমার শেষ অ্যাডভেঞ্চার...'

কী কাজের কথা বলতে চায় আলেকজান্ডার অ্যালয়সিয়াস ক্রাগ ?

সে অ্যাডভেঞ্চারে আমাদের কোনও ভূমিকা আছে কি ?

এই বন্দিদশা থেকে আমাদের মুক্তি হবে কবে ?

১৩ই মে, সকাল ৬টা

কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো নীচে ডাক পড়বে, তার আগে কাল রাত্রের ঘটনাটা লিখে ফেলি।

মাঝরাত্রে—পরে ঘড়ি দেখে জানলাম আড়াইটে—দরজায় একটা টোকার শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার ঘুম এমনিতেই পাতলা; তার উপর মনে একটা অসোয়াস্তির ভাব থাকায় বোধ হয় নিদ্রার একটু ব্যাঘাত হচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি আমাদের গ্রিক বন্ধু হেক্টর পাপাডোপুলস—তার দৃষ্টি উদ্ভাসিত, আর এই শীতেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ভদ্রলোক হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে কেবল দুটি শব্দ উচ্চারণ করলেন—'তালা খুলেছি।'

সর্বনাশ! এই স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাঝরাত্তিরে আবার এ সব কী আরম্ভ করেছেন?

'কীসের তালা?'—গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে আরও দুটি শব্দ—

'নিষিদ্ধ ঘর!'

তারপর পাপাডোপুলস যা বলল, তা এই—

দরজার সামনে তালা দেখে, এবং নিল্সকে জিজ্ঞেস করে কোনও উত্তর না পেয়ে পাপাডোপুলসের জিদ চাপে সে ঘরে সে ঢুকবেই। সেই মতলবে রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে বসে থেকে তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার করিডর দিয়ে সে সটান চলে যায় তালা দেওয়া দরজার সামনে। তারপর সেই তালা সে খোলে। কী করে খুলল জিজ্ঞেস করাতে সে পকেট থেকে এক আশ্চর্য জিনিস বার করে আমাকে দেখায়। সেটা আর কিছুই না—স্টপার লাগানো একটা ছোট শিশিতে খানিকটা তরল পদার্থ। এর কয়েক ফোঁটা একটা বন্ধ তালার চাবির গর্তের মধ্যে দিলেই কলকবজা গলে তালা নাকি আপনা থেকেই খুলে যায়। এটা নাকি পাপাডোপুলসের নিজের আবিষ্কার। এমন একটা জিনিস সে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে কেন জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, শুধু ওটা কেন, তার নানা রকম ছোটখাটো আবিষ্কারই সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক'-কে দেখাবে বলে। আমি বললাম, 'ঘরের ভিতর কী আছে দেখলে?' তাতে সে বলল ঘরে তার একা ঢুকতে সাহস হচ্ছে না, কারণ দরজা সামান্য ফাঁক করতেই সে একটা গন্ধ পেয়েছে যেটা সচরাচর চিড়িয়াখানায় পাওয়া যায়।

স্থির করলাম সামারভিলকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তিনজনেই যাব। এমনিতে হয়তো আমি পাপাডোপুলসকে নিরস্ত করতাম, কিন্তু জানোয়ারের গন্ধ কথাটা শোনার পর আমারও কৌতূহল বেড়ে গেছে।

সামারভিলেরও ঘুম দেখলাম পাতলা, দরজায় দুবারের বেশি নক্ করতে হল না। অতীব সন্তর্পণে, এখান থেকে ওখান থেকে গলে আসা মধ্যরাত্রের দিনের আলোর সুযোগ নিয়ে টর্চ না জ্বালিয়েই আমরা সেই তালা ভাঙা দরজার সামনে হাজির হলাম। দরজা ফাঁক করতেই আমিও জানোয়ারের গন্ধ পেলাম, কিন্তু সে খুবই সামান্য। পাপাডোপুলসের ঘ্রাণেন্দ্রিয় রীতিমতো তীক্ষ্ণ সেটা স্বীকার করতেই হয়। আমরা তিনজনে নিষিদ্ধ ঘরে প্রবেশ করলাম।

প্রকাণ্ড ঘর, জানালা বলতে কিছু নেই, সিলিং-এর কাছের তিনটে স্কাইলাইট দিয়ে সামান্য আলো এসে অন্ধকারের দুর্ভেদ্যতা খানিকটা দূর করেছে। যেটুকু আলো তাতেই দেখে বুঝলাম এ ঘরের জাত একেবারে আলাদা। এখানে মহামূল্য শিল্পদ্রব্য বলতে কিছু নেই; যা আছে তা একেবারে কাজের জিনিস। একজন বৈজ্ঞানিকের স্টাডি, গবেষণাগার আর

ছোটখাটো একটা কারখানা মিশিয়ে যদি একটা বিশাল ঘর কল্পনা করা যায়, তবে এটা হল সেই ঘর। এক দিকের দেয়ালের সামনে সারি সারি বুক শেলফে অজস্র বই, তার বেশির ভাগই বিজ্ঞান সংক্রান্ত। মাঝখানে তিনটে লম্বা টেবিলে নানা রকম রাসায়নিক যন্ত্রপাতি, আর অন্য দিকের দেয়ালের সামনে দুই সার স্টিলের ক্যাবিনেটের মাঝখানে একটা প্রশস্ত মেহগ্যানির টেবিল। এই টেবিলে বসেই যে ক্রাগ লেখাপড়া করেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। টেবিলের পিছনে দেয়াল থেকে ঝুলছে একটা প্রকাণ্ড পৃথিবীর মানচিত্র। সেই মানচিত্রের বিশেষ বিশেষ জায়গায় একটি করে ছোট্ট রঙিন কাগজের ফ্ল্যাগ সমেত আলপিন গুঁজে দেওয়া হয়েছে। ম্যাপের উপর টর্চ ফেলে বুঝলাম পিনগুলো লাগানো হয়েছে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের রাজধানী-সূচক বিন্দুগুলোর উপরে।

'হিপ্‌নোজেন,' হঠাৎ বলে উঠল সামারভিল।

সে ইতিমধ্যে ক্রাগের কাগজপত্র ঘাঁটতে আরম্ভ করে দিয়েছে। একটা চামড়ায় বাঁধানো মোটা খাতার প্রথম পাতাটি খুলে সে এই শব্দটা উচ্চারণ করেছে। আমার কাছে শব্দটা নতুন।

আমি সামারভিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। সে চেয়ারে বসে পড়েছে, খাতা তার সামনে টেবিলের উপর খোলা। খাতার প্রথম পাতায় লাল কালিতে লেখা 'হিপ্‌নোজেন সংক্রান্ত নোট্‌স'। তার তলায় লেখা 'এ. এ. ক্রাগ,' আর তার নীচে আজ থেকে চার বছর আগের একটা তারিখ। আমরা দুজনে একসঙ্গে খাতাটা দেখতে লাগলাম। কয়েক পাতা পড়তেই ক্রাগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ রইল না। এই সব গাণিতিক ও রাসায়নিক ফরমুলায় কোনও বুজরুকি নেই। কিন্তু কী পদার্থ এই হিপ্‌নোজেন? নামের ল্যাটিন উৎপত্তি ধরে নিলে মানে দাঁড়ায় সম্মোহন-জনক একটা কিছু ঘুমপাড়ানি ওষুধ। মনধাঁধানো কোনও প্রক্রিয়া বা ওই জাতীয় কিছু কি?

খাতার প্রথম কয়েক পাতা জুড়ে একটা প্রস্তাবনা। ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাস আর আতঙ্কের সঙ্গে আমরা দুজনে লেখাটা পড়ে শেষ করলাম। আলেকজান্ডার অ্যালয়সিয়াস ক্রাগ এই প্রস্তাবনায় তাঁর 'আসল কাজ' বা 'শেষ অ্যাডভেঞ্চার'-এর কথা বলেছেন। সে কাজটা আর কিছুই না—সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। সারা বিশ্বের লোক থাকবে তার পায়ের তলায়; জগতের যেখানে যত মিউজিয়ম, যত লাইব্রেরি, যত সংগ্রহশালা, যত আর্ট গ্যালারি আছে, তার সমস্ত অমূল্য সম্পদ এসে যাবে তার আওতার মধ্যে। এই জিনিসটা সম্ভব হবে ওই হিপ্‌নোজেনের সাহায্যে। ক্রাগের আবিষ্কার এই হিপ্‌নোজেন হল একটি বাষ্পীয় পদার্থ। এই বাষ্পীয় পদার্থ বা গ্যাস কী করে একটা শহরের উপর ছড়িয়ে দেওয়া যাবে তার দু'টি সহজ উপায় ক্রাগ বর্ণনা করেছেন; এক হল পাইপের সাহায্যে, অন্যটা প্লেন থেকে বোমা ফেলে। বোমা হবে প্লাস্টিকের তৈরি; মাটির কাছাকাছি এলে সে বোমা থেকে গ্যাস আপনিই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এতে ফল কী হবে তার আন্দাজ পাওয়া যায় ক্রাগের দেওয়া একটা হিসেব থেকে; এই গ্যাসের একটি কণা বা মলিকিউল একজন মানুষের নিশ্বাসের সঙ্গে তার দেহে প্রবেশ করলে সে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সম্মোহিত বা হিপ্‌নোটাইজড হয়ে যাবে। লন্ডন নিউইয়র্কের মতো একটা গোটা শহরের লোককে এক বছরের জন্য হিপ্‌নোটাইজড করতে একটা বোমাই যথেষ্ট। অথচ সুবিধে এই যে এ বোমায় শহরের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু সেই শহরের লোকের মন একবার দখল করতে পারলে তাদের উপর কর্তৃত্ব করার আর অসুবিধে কোথায়?

ক্রাগের এই সাংঘাতিক পরিকল্পনার কথা পড়ে আমাদের দুজনেরই কপালে ঘাম ছুটে গেছে, এ সব কথা সত্যি না পাগলের প্রলাপ তাই ভাবছি, এমন সময় একটা অস্ফুট চিৎকারে

আমাদের দৃষ্টি ঘুরে গেল ঘরের অন্য দিকে। দূরে একটা খোলা দরজার সামনে হাত দুটোকে পিছিয়ে কোমর বাঁকিয়ে চরম ত্রাসের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে হেক্টর পাপাডোপুলস।

আমরা দুজনে দৌড়ে গেলাম তার দিকে। পাপাডোপুলস পিছিয়ে যেতে আমরা দাঁড়ালাম দরজার মুখে। এখানে জানোয়ারের গন্ধ তীব্রতম। কারণ স্পষ্ট। পাশের ঘরে—এ ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট—আমাদের থেকে হাতদশেক দূরে এক জোড়া জ্বলন্ত সবুজ চোখ প্রায় নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। এ ঘরটা আরও বেশি অন্ধকার, কারণ এতে একটিমাত্র স্কাইলাইট। আমার টর্চটা জ্বালিয়ে জোড়া চোখের দিকে ফেলতে, একটা রক্ত হিমকরা দৃশ্য আমাদের সামনে ফুটে উঠল। একটি ব্ল্যাক প্যানথার দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের মাঝখানে, তার দৃষ্টি সটান আমাদের দিকে। ব্যাঘ্র শ্রেণীর এই বিশেষ জন্তুটা যে কতখানি হিংস্র হতে পারে সেটা আমার অজানা নয়। পাপাডোপুলস একটা অদ্ভুত গোঙানির শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল।

প্যানথারের ভাবগতিকে একটা অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ করে আমার মনে একটু সাহস হল। আমি জানোয়ারটার দিকে এগিয়ে গেলাম। সামারভিল আমার কাঁধ ধরে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি গ্রাহ্য করলাম না।

আমি এগিয়ে গিয়ে প্যানথারটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলাম। কোনও হিংস্র জানোয়ার যে-মানুষের দিকে এমন ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে পারে সেটা আমার ধারণা ছিল না।

আমি তার চোখের ঠিক সামনে ধরলাম আমার টর্চ। সে চোখের চাহনি নিরীহ বললে ভুল হবে, বরং নির্বোধ বললে হয়তো সত্যের কিছুটা কাছাকাছি যাওয়া যেতে পারে। এ জানোয়ার বোকা হয়ে গেছে। এ যেন কারুর আদেশ পালন করার জন্যই অপেক্ষা করছে, এর নিজস্ব শক্তি বা গরজ বলে আর কিছু নেই।

আরও একটা জিনিস লক্ষ করলাম ; বাঘের গলায় ফিতেয় বাঁধা একটা কার্ড। তাতে ছ' মাস আগের একটা তারিখ। বুঝলাম ওই দিনেই প্যানথারটির উপর ক্র্যাগের ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছিল।

সামারভিল ইতিমধ্যে তার নিজের টর্চের আলো ফেলেছে ঘরের অন্য দিকে। অবাক হয়ে দেখলাম ঘরের চারিদিকে সারি সারি কাচের বাক্স, প্রত্যেকটি বাক্সে একটি করে মারাত্মক প্রাণী, তাদের বেশির ভাগই পোকামাকড় বা সরীসৃপ জাতীয়।

আমি প্রথম বাক্সটার দিকে এগিয়ে গেলাম। কাচের উপরে তারিখ সমেত লেবেল। কাচের ভিতরে সমস্ত বাক্সটা জুড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে একটা কালকেউটে। সাপটা আমায় দেখে মাথা তুলল, কিন্তু ফণা তুলল না। আমি বাক্সের ঢাকনা খুলে হাতটা ভিতরে ঢুকিয়ে সাপটাকে খানিকটা বাইরে বার করলাম। সে সাপের মধ্যে মানুষের প্রতি আক্রোশের কোনও চিহ্ন নেই।

আমি সাপটাকে আবার বাক্সে পুরে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলাম।

ঘড়িতে দেখি প্রায় সোয়া তিনটে। আমাদের গ্রিক বন্ধুটির এখন কী অবস্থা ? বাইরে এসে দেখি সে কার্পেট থেকে উঠে একটা চেয়ারে বসেছে। বললাম, 'এবার তো ঘরে ফিরতে হয়। কাল আবার কাজ আছে, সকাল আটটায় ডাক পড়বে।'

পাপাডোপুলস আমার দিকে ভয়ার্ত চোখ তুলে বলল, 'ক্রাগ যদি সত্যিই বেঁচে ওঠে ?'

আমি বললাম, 'তা হলে আর কী ? তা হলে মানতেই হবে যে তার মতো বড় বৈজ্ঞানিক আর পৃথিবীতে নেই।'

'কিন্তু তাও এই গ্যাস যদি সে আমাদের উপর প্রয়োগ করে ?'

'সেটার উপক্রম দেখলে বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে নিরস্ত করতে হবে। আমাদের তিনজনের মাথা এক করলে কি আর একটা উপায় বেরোবে না ?'

'শঙ্কু—'

সামারভিল আমার পিঠে হাত দিয়েছে। তার দৃষ্টি একটা বিশেষ স্টিল ক্যাবিনেটের দিকে। তার দেরাজগুলোর একটার উপর সামারভিলের টর্চের আলো। দেরাজের গায়ে লেবেল মারা—'এইচ মাইনাস'।

'ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছ কি ?' সামারভিল প্রশ্ন করল। আমি বললাম, 'বোধ হয় পারছি। হিপ্‌নোজেনের প্রভাব দূর করার ওষুধ।'

সামারভিল এগিয়ে গিয়ে দেরাজটা খুলল। আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দেরাজের মধ্যে তুলোর বিছানার উপর অতি সাবধানে শোয়ানো অবস্থায় রাখা হয়েছে একটিমাত্র শিশি—হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশির চেয়ে সামান্য একটু বড়। 'ক্রিস্ট্যাল', বলল সামারভিল। ঠিকই বলেছে। শিশির মধ্যে সাদা গুঁড়ো। শিশি বার করে ছিপি খুলতেই একঝলক উগ্র মিষ্টি গন্ধ নাকে প্রবেশ করল। তৎক্ষণাৎ ছিপিটা বন্ধ করে দিল সামারভিল।

আমি ঠিক করেছিলাম পাশের ঘরের কোনও একটা সম্মোহিত প্রাণীর উপর জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখব, কিন্তু সেটা আর হল না। ঘরে একটি চতুর্থ প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে ; এতই নিঃশব্দে যে আমরা কেউই টের পাইনি। সামারভিলের টর্চটা ডান দিকে ঘুরতেই সেটা

গিয়ে পড়ল প্রাণীটার উপর।

ওডিন। খোলা দরজার সামনে দণ্ডায়মান। যে গলায় ক্রাগের মৃত্যুসংবাদ শুনেছিলাম, সেই একই গলায় বিশাল ঘরটা গমগম করে উঠল।

'তোমরা অন্যায় করেছ। আমার মনিব অসন্তুষ্ট হবেন। এখন ঘরে ফিরে যাও।'

অন্যায় আমরা সত্যিই করেছি—যদিও তার জন্য দায়ী প্রধানত আমাদের গ্রিক বন্ধুটি।

অনন্যোপায় হয়ে আমরা তিনজনে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। ওডিনের কাছাকাছি পৌঁছাতে তার ডান হাতটা সামারভিলের দিকে এগিয়ে এল। সামারভিল সুবোধ বালকের মতো তার হাতের শিশিটা ওডিনের হাতে দিয়ে দিল। ওডিন সেটি তার আলখাল্লার পাশের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজার দিকে ঘুরল। আমরা তিনজন তাকে অনুসরণ করে করিডর পেরিয়ে সিঁড়ি উঠে আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। একের পর এক তিনজনকে যার যার ঘরে পৌঁছে দিয়ে ওডিন যেভাবে এসেছিল আবার সেইভাবেই নিঃশব্দে করিডর দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ঘড়িতে পৌনে চারটা দেখে আমি আবার বিছানায় শুলাম। আমি জানি এই বিভীষিকাময় অবস্থাতে আমার ঘুম হবে না, কিন্তু চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকলে চিন্তার সুবিধা হবে। এই ক' ঘণ্টায় যা দেখলাম, যা শুনলাম, তা নিয়ে অনেক কিছু ভাবার আছে।

১৪ই মে

ক্রাগ তার শেষ অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলেছিল ; ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল আমাদের পক্ষেও এটা হবে আমাদের জীবনের শেষ অ্যাডভেঞ্চার। সেটা যে হয়নি সেটার একমাত্র কারণ...না, সেটা যথাসময়ে বলব। ঘটনাপরম্পরা রক্ষা করা উচিত। আমি সেটাই চেষ্টা করব।

সাতটায় নিল্‌স এসে ব্রেকফাস্ট দিল। আটটায় আমার ঘরের লুকোনো স্পিকারটায় আবার সেই কণ্ঠস্বর।

'মাস্টার তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। অনুগ্রহ করে তাঁর ঘরে এসো।'

সিঁড়ির মুখটাতে তিনজন একসঙ্গে হয়ে পরস্পরকে শুকনো 'গুড মর্নিং' জানিয়ে নীচে রওনা দিলাম। কারুর মুখে কথা নেই। পাপাডোপুলস রীতিমতো অস্থির ও নার্ভাস। দেখলাম ও ভাল করে দাড়িটা পর্যন্ত কামাতে পারেনি। পেট ভরে ব্রেকফাস্ট করেছে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ। যাই হোক, তাকে আর প্রশ্ন করে বিব্রত করব না।

ক্রাগের ঘরের জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে রোদ ঢুকতে দেওয়া হয়েছে ; এখন ঘরের আনাচেকানাচেও আর অন্ধকারের কোনও চিহ্ন নেই। খাটের উপরে রোদ এসে পড়েছে, এমনকী ক্রাগের মুখেও। সে মুখ যে মৃত ব্যক্তির মুখ সেটা আর বলে দিতে হয় না।

ওডিন খাটের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, এবার সে তার মনিবের মৃতদেহ অনায়াসে দু' হাতে তুলে নিয়ে আমাদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'ফলো মি।'

আমরা আবার সার বেঁধে তাকে অনুসরণ করলাম। তিনটে দীর্ঘ করিডর পেরিয়ে দুর্গের একেবারে অপর প্রান্তে একটা খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে দেখি সামনেই একটা সিঁড়ি পাক খেয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। ক্রাগের এই বিশেষ ঘরটি তা হলে ভূগর্ভে!

ত্রিশ ধাপ সিঁড়ি নেমে ওডিনের পিছন পিছন আমরা যে ঘরটাতে পৌঁছোলাম, সে রকম ঘরের কথা একমাত্র উপন্যাসেই পড়া যায়। এ ঘরে প্রাকৃতিক আলো প্রবেশের কোনও পথ নেই ; তার বদলে রয়েছে নীলাভ বৈদ্যুতিক আলো। ঘরের মাঝখানে একটা অপারেটিং

টেবিল, তারই উপরে শেডযুক্ত আলোটি ঝোলানো রয়েছে। টেবিলটাকে ঘিরে রয়েছে নানা রকম কাচের টিউব, ইলেকট্রোড, ইন্ডিকেটর, এটা ওটা চালানো ও বন্ধ করার জন্য সুইচ ও বোতাম, মৃতদেহের মাথার উপর পরিয়ে দেবার জন্য একটা তারযুক্ত হেলমেট। অপারেটিং টেবিলের পায়ের দিকে আরেকটা তেপায়া টেবিলের উপর নানা রকম ওষুধপত্র—প্রত্যেকটির জন্য একটি করে আলাদা রঙের বোতল। এ সব জিনিসের কোনওটাই আমার কাছে অপরিচিত নয়, কিন্তু সব জিনিস একসঙ্গে একটা মরা মানুষের উপর প্রয়োগ করলে কী ফল হতে পারে তা আমার জানা নেই।

ওডিন ক্রাগের মৃতদেহ অপারেটিং টেবিলের উপর শুইয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমাদের দৃষ্টি এবারে চলে গেছে টেবিলের পাশে টাঙানো একটা চার্টের উপর। তাতে পরিষ্কার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লেখা রয়েছে আমাদের এখন কী কী করণীয়। চার্টে শরীরটাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে ; উপরভাগ অর্থাৎ মাথা, মধ্যভাগ অর্থাৎ কাঁধ থেকে কোমর, আর নিম্নভাগ অর্থাৎ কোমর থেকে পায়ের পাতা।

'ফাইভ মিনিটস টু গো !'

একটা নতুন কণ্ঠস্বরে আমরা তিনজনেই চমকে উঠলাম।

'রিড ইনস্ট্রাক্শন্স কেয়ারফুলি অ্যান্ড প্রোসিড !'

এইবারে চোখ গেল ঘরের এক কোণের দিকে। আর একটি দীর্ঘকায় দানব সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওডিনেরই মতো পোশাক, যদিও আলখাল্লার রং লালের বদলে গাঢ় নীল। আরেকটা তফাত হল এই যে এর হাতে একটা অস্ত্র রয়েছে ;—একটি অতিকায় হাতুড়ি।

'থর !'—আমি আর সামারভিল প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম। নরওয়ের পুরাণে দেবতাদের মধ্যে থরের স্থান ওডিনের পরেই, আর থরের বিখ্যাত হাতিয়ার হাতুড়ির কথা তো সকলেই জানে। বুঝলাম এই বিশেষ গবেষণাগারটির তদারকের ভার এই থরের উপরেই। অপারেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় কি না সে দিকেও দৃষ্টি রাখবে এই থরই।

আমরা আর সময় নষ্ট না করে আমাদের কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। নানান দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও এই অভাবনীয় এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল সম্পর্কে একটা অদম্য কৌতূহল বোধ করছি। সামারভিলকে বললাম, 'আমি মাথার দিকটা দেখছি, তুমি মাঝখানটার ভার নাও, আর পাপাডোপুলস পায়ের দিক।'

কথাটা বলামাত্র পাপাডোপুলসের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ করলাম। সে যেন মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'দোহাই তোমার, আমাকে ছেড়ে দাও, এ জিনিস আমার দ্বারা হবে না !'

আমরা দুজনেই অবাক। লোকটা বলে কী !

'হবে না মানে ?' আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বললাম। 'তুমি নিজে বৈজ্ঞানিক হয়ে এই পরিষ্কার ভাষায় লেখা এই সামান্য নির্দেশগুলো মেনে কাজ করতে পারবে না ?'

পাপাডোপুলস গভীর অপরাধের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি বৈজ্ঞানিক নই। বৈজ্ঞানিক আমার ভাই হেকটর—আমার যমজ ভাই। সে এখন অসুস্থ ; এথেনসে হাসপাতালে রয়েছে। ক্রাগের নেমন্তন্ন পেয়ে আমি হেকটরের পরিবর্তে চলে এসেছি শুধু লোভে পড়ে।'

'কীসের লোভ ?'

'দামি জিনিসের লোভ। আমি জানতাম ক্রাগের মহামূল্য সংগ্রহের কথা। ভেবেছিলাম এই সুযোগ—'

সামারভিল তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'তুমিই কি নিকোলা পাপাডোপুলস, যে বছর দশেক আগে হল্যান্ডের রাইক মিউজিয়ম থেকে ডি. হুচের একটা ছবি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলে ?'

আমাদের গ্রিক বন্ধুটির মাথা হেঁট হয়ে গেল।

'টু মিনিটস টু গো !' বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠল থর।

সিঁড়ির দরজার পাশেই একটা কাঠের চেয়ার ছিল, পাপাডোপুলস সেই চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল। সত্যি কথাটা বলে ফেলে তাকে যেন খানিকটা ভারমুক্ত বলে মনে হচ্ছে।

আমরা দুজনে কাজে লেগে গেলাম। কাজটা আমাদের কাছে খুব কঠিন নয়, তাই তিনজনের জায়গায় দুজন হলেও বিশেষ অসুবিধা হবে না। দু' মিনিটের মধ্যেই চার্টের নির্দেশ অনুযায়ী সব কিছু রেডি করে ফেললাম। ঘড়িতে যখন ন'টা, তখন থরের কণ্ঠে নির্দেশ এল—

'নাউ প্রেস দ্য সুইচ।'

আমরা প্রস্তুতই ছিলাম, টেবিলের ডান পাশে জ্বলন্ত লাল বাল্‌বের নীচে সাদা বোতামটা টিপে দিলাম। টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটি তীক্ষ্ণ কম্পমান বাঁশির মতো শব্দ, আর তার সঙ্গে একটা গুরুগম্ভীর স্বরে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত তিব্বতি মন্ত্রের মতো শব্দে ভূগর্ভস্থিত ল্যাবরেটরিটা গমগম করতে লাগল। দ্বিতীয় শব্দটা যে কোথা থেকে আসছে তা বুঝতেই পারলাম না।

আমি এতক্ষণে ভাল করে মৃতদেহটার দিকে দেখবার সুযোগ পেলাম। টেবিলের উপর রাখা শীর্ণ হাতের শিরা উপশিরা, আর রক্তের অভাবে পাংশুটে হয়ে যাওয়া মুখের অজস্র বলিরেখা দেখে লোকটার বয়স প্রায় দেড়শো ভেবে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে না। দেহ এখন অনড়, অসাড় হয়ে পড়ে আছে টেবিলের উপর—মাথার উপর দিকটা হেলমেটে ঢাকা, সেই হেলমেট থেকে সতেরোটা ইলেকট্রোড বেরিয়ে এদিকে ওদিকে চলে গেছে। দেহের সর্বাঙ্গ সাদা চাদরে ঢাকা, কেবল মাথা, হাতদুটো আর পায়ের পাতাটা বাইরে বেরিয়ে আছে। কপালের দু'পাশে, গলার দু'পাশে এবং হাত ও পা থেকে আরও টিউব বেরিয়ে এদিকে ওদিকে গেছে। শরীরের অনাবৃত অংশের বারোটা জায়গায় চামড়া ভেদ করে চিনে অ্যাকুপাংচারের কায়দায় পিন ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা জানি বারোটার আগে কিছু হবে না। তার পরেও কিছু হবে কি না সে বিষয়ে আমার এখনও সন্দেহ আছে, কারণ যন্ত্রপাতির মধ্যে বাইরে থেকে কিছু অভিনবত্ব চোখে পড়ে না, একমাত্র নাকের ফুটো দিয়ে টিউবের সাহায্যে কী জাতীয় তরল পদার্থ ফোঁটা ফোঁটা করে দেহের মধ্যে চালান দেওয়া হচ্ছে সেটা আমি জানি না। সত্যি বলতে কী, এমনিতে বিশ্বাস একেবারেই হত না—কিন্তু আজ ভোর রাত্তিরে হিংস্র জানোয়ারের উপর হিপ্‌নোজেনের যে প্রভাব লক্ষ করেছি, তাতে ক্রাগের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না।

অন্যমনস্কতার জন্য এতক্ষণ খেয়াল করিনি, হঠাৎ দরজার দিকে চোখ পড়াতে দেখি পাপাডোপুলস উধাও। পালাল নাকি লোকটা ? সামারভিলও অবাক। বলল, 'হয়তো দেখবে এই ফাঁকে দেওয়াল থেকে এটা সেটা সরিয়ে বাক্সে পুরছে।' পাপাডোপুলসকে দেখে প্রথম থেকেই মনে একটা সন্দেহের ভাব জেগেছিল ; অনুমান মিথ্যে নয় জেনে এখন বরং খানিকটা নিশ্চিন্তই লাগছে।

ঘড়িতে এগারোটা পেরোতেই বুঝতে পারলাম আমার মন থেকে অন্য সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে গিয়ে মনটা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ওই মৃতদেহে। একটা সবুজের আভাস লক্ষ করছি ক্রাগের সারা মুখের উপর। সামারভিল আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতটা সে আমার হাতের

উপর রাখল। হাত ঠাণ্ডা। সামারভিলের মতো মানুষও আজ এই মুহূর্তে দুর্বল, ভয়ার্ত। আমি তার হাতের উপর পালটা চাপ দিয়ে তার মনে সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা করলাম। থরের দিকে চেয়ে দেখলাম সে ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। ওডিনের মতো এরও চোখে পলক নেই।

বারোটা বাজতে যখন পাঁচ মিনিট বাকি তখন লক্ষ করলাম আমারও হৃৎস্পন্দন বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে; তার একটা কারণ অবশ্য এই যে, থর এবার তার স্বাভাবিক জায়গা ছেড়ে চারটি বিশাল পদক্ষেপে একেবারে আমাদের দুজনের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা যান্ত্রিক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম হাতুড়ি সমেত তার হাতটা আস্তে আস্তে উঠে একটা জায়গায় এসে থেমে রইল। অর্থাৎ এই চরম মুহূর্তে আমাদের দিক থেকে কোনও গলদ হলেই হাতুড়ি আমাদের মাথায় এসে পড়বে।

ঠিক এক মিনিট বাকি থাকতে থরের কণ্ঠে শুরু হল এক অদ্ভুত আবৃত্তি। সে তার মনিবকে ফিরে আসতে বলছে—

'মাস্টার, কাম ব্যাক্ !...মাস্টার, কাম ব্যাক্ !... মাস্টার, কাম ব্যাক্ !'...

এ দিকে অন্য শব্দ সব থেমে আসছে। সেই কম্পমান বংশীধ্বনি, সেই তিব্বতি স্তোত্র, একটা দুরমুশ পেটার মতো শব্দ আধ ঘণ্টা আগে আরম্ভ হয়েছিল, সেটাও। এখন ক্রমে সে সব মুছে গিয়ে শুধু রয়েছে থরের কণ্ঠস্বর।

আমি আর সামারভিল সম্মোহিতের মতো চেয়ে আছি ক্রাগের মৃতদেহের দিকে। চামড়ার সবুজ ভাবটা দ্রুত মিলিয়ে আসছে আমাদের চোখের সামনে। তার বদলে লালের প্রলেপ পড়ছে ক্রাগের মুখে।

ক্রমে সে লাল বেড়ে উঠল। সেই সঙ্গে অলৌকিক ভেলকির মতো মুখের বলিরেখাগুলো একে একে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল।

ওই যে হাতের শিরায় স্পন্দন শুরু হল! আমার দৃষ্টি টেবিলের পিছনে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো বৈদ্যুতিক ঘড়িটার দিকে। সেকেন্ড হ্যান্ডটা টিকটিক টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে ১২-র দিকে। আর পাঁচ সেকেন্ড। আর চার... তিন... দুই...এক...

'মাস্টার !'

থরের উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট পৈশাচিক চিৎকারে আমরা দুজনেই ছিটকে পিছিয়ে টাল হারিয়ে পড়লাম থরের পায়ের তলায়। সেই অবস্থাতেই দেখলাম আলেকজান্ডার অ্যালয়সিয়াস ক্রাগের দুটো শীর্ণ হাত সজোরে নিজেদের বন্ধনমুক্ত করে শূন্যে প্রসারিত হল। তার পরমুহূর্তে ক্রাগের দেহের উপরার্ধ সটান সোজা হয়ে বসল খাটের উপর।

'বিশ্বাস হল ? বিশ্বাস হল ?'

ক্রাগের আস্ফালনে অপারেটিং রুমের কাচের জিনিস ঝনঝন করে উঠল।

'আমিই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সে কথা বিশ্বাস হল ?'

আমরা দুজনেই চুপ, এবং ক্রাগও যে 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্' বলে ধরে নিলেন, সেটা বেশ বুঝতে পারলাম, কারণ তাঁর মুখে ফুটে উঠল এক পৈশাচিক হাসি। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে হাসি মিলিয়ে গেল। সে একদৃষ্টে আমাদের দুজনের দিকে দেখছে। তারপর তার দৃষ্টি চলে গেল দরজার দিকে।

'পাপাডোপুলস...তাকে দেখছি না কেন ?'

এতক্ষণে খেয়াল হয়েছে ক্রাগের।

'কোথায় পাপাডোপুলস ?' তিনি এবার প্রশ্ন করলেন। 'সে তোমাদের সাহায্য করেনি ?'

'সে ভয় পাচ্ছিল,' বলল সামারভিল। 'তাকে আমরা রেহাই দিয়েছি।'

ক্রাগের মুখ থমথমে হয়ে গেল।

'কাপুরুষের শাস্তি একটাই। সে বিজ্ঞানের অবমাননা করেছে। পালিয়ে গিয়ে মূর্খের মতো কাজ করেছে সে, কারণ এ দুর্গে প্রবেশদ্বার আছে, কিন্তু পলায়নের পথ নেই।'

এবার ক্রাগের দৃষ্টি আমাদের দিকে ঘুরল। ক্রোধ চলে গিয়ে সেখানে দেখা দিল এক অদ্ভুত কৌতুকের ভাব।

টেবিল থেকে ধীরে ধীরে নেমে সে আমাদের সামনে দাঁড়াল। তার দৃপ্ত ভঙ্গিতে বুঝলাম

সে পুনর্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্যৌবন ফিরে পেয়েছে। তার গলার স্বরেও আর বার্ধক্যের কোনও চিহ্ন নেই।

'থর আর ওডিনকে দিয়ে আর কোনও প্রয়োজন নেই আমার,' গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন ক্রাগ। 'তাদের জায়গা নেবে এখন তোমরা দুজন। যান্ত্রিক মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি সীমিত। তোমাদের বুদ্ধি আছে। তোমরা আমার আদেশ মতো কাজ করবে। যে লোক সারা বিশ্বের মানুষের উপর কর্তৃত্ব করতে চলেছে, তারই অনুচর হবে তোমরা।'

ক্রাগ কথা বলতে বলতেই এক পাশে সরে গিয়ে একটা ছোট ক্যাবিনেটের দরজা খুলে তার থেকে একটা জিনিস বার করেছেন। একটা পাতলা রবারের মুখোশ। সেটা মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে পরে ক্রাগ তাঁর ডান হাতটা একটা সুইচের দিকে প্রসারিত করলেন। আমি জানি সুইচটা টিপলে কোনও অদৃশ্য ঝাঁঝরি বা নলের মুখ থেকে একটি সর্বনাশা গ্যাস নির্গত হবে, এবং তার ফলে আমরা চিরকালের মতো—

'মাস্টার!'

ক্রাগের হাত সুইচের কাছে এসে থেমে গেল। সিঁড়ির মুখে নিল্‌স এসে হাঁপাচ্ছে, তার চোখে বিহ্বল দৃষ্টি।

'প্রোফেসর পাপাডোপুলস পালিয়েছেন!'

'পালিয়েছে?'

ক্রাগ যেন এ কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না!

'ইয়েস মাস্টার। প্রোফেসর সেই বন্ধ ঘরের সামনে গিয়েছিলেন; দরজার তালা ভাঙা, তাই হেনরিক সেখানে পাহারা দিচ্ছিল। হেনরিকের হাতে রিভলভার ছিল। প্রোফেসর তাকে দেখে পালায়। হেনরিক পিছু নেয়। প্রোফেসর দুর্গের পশ্চিম দেয়ালের বড় জানালাটা দিয়ে বাইরে কার্নিশে লাফিয়ে পড়েন। প্রোফেসর অত্যন্ত ক্ষিপ্র, অত্যন্ত—'

নিল্‌সের কথা শেষ হল না। একটা নতুন শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই শব্দ এতই অপ্রত্যাশিত যে, ক্রাগও হতচকিত হয়ে সুইচ থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে।

শব্দটা এবার আরও কাছে। নিল্‌সের মুখ কাগজের মতো সাদা। সে দরজার সামনে থেকে ছিটকে সরে এল। পরমুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড হুঙ্কার দিয়ে সিঁড়ি থেকে এক লাফে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করল একটা জানোয়ার। ঘরের নীল আলো তার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ রোমশ দেহে প্রতিফলিত। তার গলায় এখনও ঝুলছে সেই তারিখ লেখা কার্ড।

একটা অদ্ভুত গোঙানির শব্দ বেরোচ্ছে ক্রাগের মুখ থেকে। সেই শব্দ অতি কষ্টে উচ্চারিত দুটো নামে পরিণত হল—

'ওডিন! থর!'

ক্রাগ চেঁচাতে গিয়েও পারলেন না। এদিকে থর নিথর, নিস্পন্দ।

সামারভিল থরের হাত থেকে বিশাল হাতুড়িটা বার করে নিল। দু' হাতে সেটাকে শক্ত করে ধরে দু' পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। জানোয়ার আমাদের আক্রমণ করলে ওই হাতুড়িতে আত্মরক্ষা হবে না জানি; আর এও জানি যে, জানোয়ারের লক্ষ্য আমাদের দিকে নয়। সে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে তারই দিকে যে এত দিন তাকে বোকা বানিয়ে রেখেছিল।

বিপদের চরম মুহূর্তে আমার মাথা আশ্চর্যরকম পরিষ্কার থাকে সেটা আগেও দেখেছি। ক্রাগের ডান হাত সুইচের দিকে এগোচ্ছে দেখে, এবং সে গ্যাসের সাহায্যে বাঘ সমেত আমাদের দুজনকে বিধ্বস্ত করতে চাইছে জেনে আমি বিদ্যুদ্বেগে এক হ্যাঁচকা টানে তার মাথা থেকে মুখোশটা খুলে ফেললাম। আর সেই মুহূর্তে ব্ল্যাক প্যানথারও পড়ল তার উপর

boiRboi.blogspot.com

লাফিয়ে। ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ির দিকে দৌড়ে যাবার সময় শুনলাম ক্রাগের অভ্রভেদী আর্তনাদ। আর তার পরমুহূর্তেই শুনলাম পরিচিত গলায় আমাদের নাম ধরে ডাক।

'শঙ্কু ! সামারভিল !'

আমরা উপরের করিডরে পৌঁছে গেছি, কিন্তু পাপাডোপুলস কোত্থেকে ডাকছে সেটা চট করে ঠাহর হল না। এই গোলকধাঁধার ভিতরে শব্দের উৎস কোন দিকে সেটা সব সময় বোঝা যায় না।

সামনে ডাইনে একটা মোড়। সেটা ঘুরতেই সেই নিষিদ্ধ দরজা পড়ল। সেটা এখন খোলা। তার সামনে পা ছড়িয়ে রক্তাক্ত দেহে মরে পড়ে আছে একটি লোক। বুঝলাম ইনিই হেনরিক, এবং ইনিই প্যানথারের প্রথম শিকার।

করিডরের মাথায় এবার দেখা গেল পাপাডোপুলসকে। সে খানিকটা এসেই থমকে থেমে ব্যস্তভাবে হাতছানি দিয়ে চিৎকার করে উঠল—'চলে এসো—রোড ক্লিয়ার !'

আমরা তিনজনে তিনটে ঘর পেরিয়ে ওয়েটিং রুমের দরজা দিয়ে কেল্লার বাইরে এসে পড়লাম। পাপাডোপুলসের হাতের রিভলভারটি আগে নিঃসন্দেহে হেনরিকের হাতে ছিল। ওই একটি রিভলভারে পলায়ন পথের সব বাধা দূর হয়ে গেল এবং ওই একই রিভলভারে ওপেলের ড্রাইভার পিয়েট নরভালকে বশে এনে তিনজনে গাড়িতে চেপে রওনা দিলাম অস্‌লো এয়ারপোর্টের উদ্দেশে। পাসপোর্ট এবং রিটার্ন টিকিট সঙ্গেই আছে, সুতরাং আর কোনও বাধা নেই।

কম্পাউন্ড পেরিয়ে, গেট পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় পড়ে পাপাডোপুলসকে প্রশ্ন করলাম, 'ব্যাপারটা কী ? জানালা টপকে তো কার্নিশে নামলে, তারপর ?'

পাপাডোপুলস তার হাতের অস্ত্রটি মোটরচালকের দিক থেকে না নামিয়েই বলল, 'অত্যন্ত সহজ। কার্নিশে নেমে সোজা গিয়ে হাজির হলাম চিড়িয়াখানার ঘরের বাইরে। তারপর পাথরের খাঁজে হাত আর পা গুঁজে স্কাইলাইটে পৌঁছাতে আর কতক্ষণ ?'

'তারপর ?' আমি আর সামারভিল সমস্বরে প্রশ্ন করলাম।

'তারপর আর কী—সঙ্গে শিশি ছিল। ছিপি খুলে স্কাইলাইটের মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে এইচ. মাইনাসের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম।'

আমরা দুজনেই অবাক। বললাম, 'তোমার সঙ্গে শিশি ছিল কী রকম ? কাল তো ওডিন সেটাকে পকেটে পুরল।'

পাপাডোপুলসের ঘন কালো গোঁফের নীচে দু' পাটি সাদা দাঁত দেখা দিল।

'এথেন্‌সের রাজপথে এক বছরে অন্তত এক হাজার লোকের পকেট মেরেছি ছেলেবেলায়, আর একটা অন্ধকার করিডরে একটা রোবটের পকেট মারতে পারব না ?'

এই বলে সে তার বাঁ হাতটি আমাদের দিকে তুলে ধরল।

অবাক হয়ে দেখলাম, সেই হাতে একটা বিশাল হিরের আংটি সাতরঙের ছটা বিকীর্ণ করে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

'মরা মানুষের হাতের আংটি খুলে নেওয়ার মতো সহজ কাজ আর নেই।' বলল নিকোলা পাপাডোপুলস।

সন্দেশ। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৩৮৩